রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজা* নাটক অবলম্বনে *রাজা ও অন্যান্য...* নাট্যে নিম্নবর্গের প্রতিরূপায়ণ

তানভীর নাহিদ খান*

[**সারসংক্ষেপ** : কবিতা, সংগীত, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, দর্শন ইত্যাদির পাশাপাশি নাট্যসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অন্যতম নাটক *রাজা*। অন্যদিকে প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রতিককালে এক নূতন দ্বার উন্মোচন করেছে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা। প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে চর্চিত হওয়ায় নিম্নবর্গ বিষয়টি নানামাত্রিক বিশ্লেষণ ও আলোচনার দাবি রাখে। ১৯১০ সালে রচিত *রাজা* নাটকে উচ্চবর্গ, নিম্নবর্গ সম্পর্কের নানা মাত্রা দেখা যায়। বয়স, শ্রেণি, লিঙ্গ, পেশা, বর্ণ বিভিন্ন কারণেই মানুষ নিম্নবর্গীয় হয়। নিম্নবর্গীয় মানুষ অনেকক্ষেত্রে সামষ্টিক পরিচয়ে পরিচিত হলেও তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিক পরিচয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আলোচ্যমান প্রবন্ধে নিম্নবর্গ অধ্যয়নের আলোকে *রাজা* নাটক অবলম্বনে প্রাচ্যনাট প্রযোজিত *রাজা এবং অন্যান্য...* নাট্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষের চৈতন্যের স্বরূপ অনুসন্ধান ও কোন প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্গ উপস্থাপিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা হবে।]

সংকেত শব্দ : নাট্যসাহিত্য, নিম্নবর্গ, উচ্চবর্গ, শ্রেণিচেতনা।

১.১ ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১০ সালে *রাজা* নাটক রচনা করেন। *মহাবস্তু* গ্রন্থের রাজা কুশের বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়। ১৯১৬ এবং ১৯২১ সালে *অরূপরতন* এবং *শাপমোচন* নামে *রাজা* নাটকের আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রাচ্যনাট নামক গ্রুপ থিয়েটার দলটি আত্মপ্রকাশ করে। দলটি *রাজা* নাটক অবলম্বনে *রাজা এবং অন্যান্য...* নামে প্রযোজনা মঞ্চায়ন করে। নাটকটি নির্দেশনা প্রদান করেন আজাদ আবুল কালাম। আলোচ্যমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯১০ সালে রচিত *রাজা* নাটক অবলম্বনে প্রাচ্যনাট প্রযোজিত *রাজা এবং অন্যান্য...* নাটকে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নাটক পর্যবেক্ষণ, প্রযোজনার চিত্র ও সংগৃহীত তথ্য আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান প্রবন্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরূপায়ণ বিশ্লেষণ করা হবে।

১.২ নিম্নবর্গ

'নিম্নবর্গ' শব্দটি ইংরেজি 'Subaltern'-এর পরিভাষা। নিম্ন শব্দটি সাধারণত তুচ্ছ বা হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে বর্গ বলতে দল, বিভাগ, শ্রেণি ইত্যাদি বোঝায়। সাবঅল্টার্ন শব্দের সাধারণ অর্থ অধস্তন, নিম্নস্থিত। ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ সাবঅর্ডিনেট। সাবঅল্টার্ন এর বাংলা হিসেবে নিম্নবর্গ পরিভাষা করেন রণজিৎ গুহ। মুসোলিনির কারাগারে বন্দি নব্য মার্ক্সবাদী ইতালিয়ান দার্শনিক আন্তনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) সাবঅল্টার্ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

*সহকারী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কারাগারে বসে তাঁর লেখা *কারাগারের নোটবই*-এ তিনি সাবঅল্টার্ন-এর উল্লেখ করেন। গ্রামশির লেখায় সাবঅল্টার্ন বলতে বুর্জোয়া সমাজে পুঁজিমালিক দ্বারা শোষিত শ্রমিক শ্রেণিকে যেমন বুঝায় তেমনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আধিপত্য বজায়কারীর দ্বারা শোষিত শ্রেণিকেও বুঝায়। গ্রামশির বিন্যাসে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাবঅল্টার্ন হলো শ্রমিক শ্রেণি এবং তার বিপরীতে হেজেমনিক শ্রেণি হলো পুঁজিপতি। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজের বাইরেও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য পর্বে সাবঅল্টার্ন শ্রেণি বিদ্যমান রয়েছে, যার বিপরীত শ্রেণি হলো আধিপত্য বজায়কারী প্রভুশ্রেণি। আধিপত্য বজায়কারী পুঁজিপতি শ্রেণি যে কেবল রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করে তা- নয়, তারা সামাজিক কর্তৃত্বও নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের ভাবাদর্শের জগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে আধিপত্যকামী শ্রেণি শাসনের ভিত সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

নিম্নবর্গ কেবল একটি শ্রেণি নয় বরং একই সমাজে অবস্থানকারী নিম্নবর্গ সেই সমাজেই তার চেয়ে নিচের স্তরের কারো চাইতে হয়ত উচ্চবর্গ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জমিদারের চেয়ে ধনী কৃষক নিম্নবর্গ। এই ধনীকৃষক আবার মজুরের চেয়ে উচ্চবর্গ।

> পুঁজিবাদী সমাজের বাইরে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুশ্রেণি ও নিম্নস্থিত শ্রেণির কথা বলতে গিয়ে গ্রামশি, "জোর দিয়েছেন কৃষক শ্রেণির চেতনার সীমাবদ্ধতার উপর। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণি, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন।" (পার্থ, ১৯৯৮ : ৪)

গ্রামশি এখানে নিম্নবর্গের চেতনার সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। প্রভুশ্রেণি ও নিম্নবর্গ শ্রেণি পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। তাই তাদের চেতনার মেরুকরণও বিপরীতমুখী হওয়া উচিত, কিন্তু নিম্নবর্গের চেতনা অনেকাংশেই প্রভুশ্রেণির মতাদর্শের খোলসে আচ্ছন্ন থাকে। গ্রামশি সাবঅল্টার্ন শ্রেণির চেতনার সীমাবদ্ধতার কথা বললেও একই সাথে স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির ইঙ্গিতও দিয়েছেন। যদিও ইঙ্গিতের সঠিক তাৎপর্য তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। তবে এই ইঙ্গিতের আলোকেই 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। এরিক স্টোকস, রণজিৎ গুহ প্রমুখের লেখায় প্রভাবিত হয়ে মূলত ভারতবর্ষের ইতিহাস নূতন করে দেখা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের তাগিদে ১৯৮২ সালে 'Subaltern Studies Group' কাজ শুরু করে। নব্বইয়ের দশকে গুহের সম্পাদনায় নিম্নবর্গ অধ্যয়নের ছয় খণ্ড সিরিজ বের হয়। কেবল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা নয়, বরং প্রচলিত ও সার্বভৌম ক্ষমতার বাইরেও ক্ষমতার অচলিত রূপ আছে এবং প্রতিনিয়ত ক্ষমতার নানা মেরুকরণ দেখা দেয়। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'Can the subaltern speak?' প্রবন্ধে বলেন, "The same class or element which was dominant in one area could be among the dominated in other" (Gayatri, ১৯৯৪ : ৭৯)। তাই ঊর্ধ্বতন/অধঃস্তনের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে সহজাতভাবে, কেননা উভয়ের চেতনা বরাবর বিপরীতমুখী। সুতরাং একই প্রবাহ ধরে কালক্রমে এগিয়ে যাওয়ার ধারণার চেয়ে ঊর্ধ্বতন/অধঃস্তনের চেতনার দ্বান্দ্বিক প্রকাশ ঘটা বরং স্বাভাবিক।

সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের চেতনার বৈপরীত্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। যেহেতু প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণি, এবং যেহেতু এই শ্রেণিদ্বন্দ্বের রাজনৈতিক প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি শ্রেণিই সক্রিয়, কেবল উচ্চবর্গই সক্রিয় আর নিম্নবর্গ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এমন নয়। সুতরাং ধরে নিতে হয় উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীত অবস্থানে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনও না কোনওভাবে তার স্বকীয়তা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তা যদি না হতো, তাহলে শ্রেণিদ্বন্দ্বের কোনও রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটা সম্ভব হতো না। বস্তুত তাহলে কোনও দ্বন্দ্বই থাকত না, নিম্নবর্গের অস্তিত্ব উচ্চবর্গের চেতনার সার্বিকতায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেত।

> কিন্তু উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ সম্পর্কের মধ্যে দুটি চেতনা যে স্বতন্ত্র তা যেমন সত্য, তেমনি উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতাও সমানভাবেই সত্য। অর্থাৎ নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। এই দ্বান্দ্বিক রূপটিকে অবলম্বন করেই নিম্নবর্গের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। [...] অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। (পার্থ, ১৯৯৮ : ৬-৭)

ক্ষমতা, সুবিধাভোগ, আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি পর্যালোচনা করে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায়। উচ্চবর্গের আধিপত্যকামী মানসিকতার কারণে নিম্নবর্গের আত্মোন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচিত হয়েছে উচ্চবর্গের হাতে। সেখানে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা এসেছে নিতান্তই দায়সারাভাবে। উচ্চবর্গের প্রচলিত ইতিহাস মোকাবেলা করার এক দৃঢ় প্রত্যয় ছিল নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চৈতন্যে। রণজিৎ গুহ বলেন, "ছাঁচে সাজানো ইতিহাসবিদ্যায় জাতীয় আন্দোলনকে উচ্চবর্গের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ও চালিত নির্ভেজাল আদর্শবাদী সংগ্রামের চেহারা দেওয়া হয়" (রণজিৎ, ১৯৯৮ : ২৮)। ফলে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং নিম্নবর্গের প্রতি উপেক্ষার ফলে ইতিহাসের প্রামাণ্য মুখ্যত উচ্চবর্গের সমৃদ্ধি ও বীরত্ব ও রাজনৈতিক মুন্সিয়ানাকে কেন্দ্র করে নির্মিত।

২.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *রাজা* নাটকের সারাৎসার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রূপক-সংকেত পর্বের অন্যতম নাটক *রাজা*। ১৯১০ সালে নাটকটি রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ রচিত *রাজা* নাটকের গল্প *মহাবস্তু* গ্রন্থের রাজা কুশের বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বনে রচিত। বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকে গৃহীত গল্পে পৌরাণিক আবহ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। *রাজা* নাটকের রাজা থাকেন অন্ধকার ঘরে। রাজার স্ত্রী রানি সুদর্শনা। বাল্যকালে তাদের বিয়ে হলেও রানি এখনও রাজাকে দিনের আলোতে দেখেনি। রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে তাদের সাক্ষাৎ হয়। রানি নানাভাবে চেষ্টা করেন রাজার চেহারা দেখতে। কিন্তু রাজা রানির সামনে আলোতে আসতে রাজি হন না। দাসী সুরঙ্গমা রানির সেবায় নিয়োজিত। রাজার প্রতি সুরঙ্গমার ভক্তি প্রবল। যৌবনে রাজাই তাকে সুপথে ফিরিয়ে এনেছিল। সুরঙ্গমা রাজাকে দেখতে পায় সেবার মধ্য দিয়ে। সুদর্শনা তার কাছে রাজার রূপের কথা জানতে চাইলে সুরঙ্গমা ধোঁয়াশাপূর্ণ জবাব দেয়। রানি রাজার নিকট দেখা করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। রাজা বসন্ত উৎসবে বের হবার প্রতিশ্রুতি দিলেও রানিকে নিজে থেকেই চিনে নিতে হবে, এই শর্তও যুক্ত করেন। রাজ্যের লোকেরাও কখনও রাজাকে দেখেনি। রাজা আদৌ আছে কিনা, তা নিয়েও অনেকের সন্দেহ আছে। পথে লোকজনের রাজা সম্বন্ধে কানাঘুষার ভিড়ে একজন মানুষ এক্ষেত্রে সংশয়ের ঊর্ধ্বে। তিনি ঠাকুরদা। ঠাকুরদা'র সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব, তিনিও রাজাকে চেনেন।



চিত্র ১ : পথের দৃশ্যে ঠাকুরদা

রাজা সম্বন্ধে তিনি প্রশ্নহীন, উদ্বেগহীন। লোকজন এসে রাজা সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল ঠাকুরদার নিকট বর্ণনা করে। ঠাকুরদা নিঃসংকোচে সমস্ত প্রশ্নের জবাব প্রদান করে। এদিকে উৎসবে জুয়াড়ি সুবর্ণ সুযোগ বুঝে নিজেকে রাজা হিসেবে উপস্থাপন করে।



চিত্র ২: জুয়াড়ি সুবর্ণ নিজেকে রাজা হিসেবে পরিচয় প্রদান করছে।

সুদর্শনা সুবর্ণকে রাজা ভাবে। তার এই ভ্রান্তি যে ধরিয়ে দিতে পারতো, সেই সুরঙ্গমাও তখন সাথে ছিল না। সুবর্ণর এই কৌশল চতুর কাঞ্চীরাজের নিকট ধরা পড়ে। রানি রোহিণীকে দিয়ে সুবর্ণর নিকট ফুলের অর্ঘ্য প্রেরণ করে। সুবর্ণ এর অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়। কাঞ্চীরাজ তখন সুবর্ণর গলা থেকে মালা খুলে রোহিণীকে দিয়ে রানির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়। সুবর্ণর আনাড়িপনায় রানি কষ্ট পেয়েও মালাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। বসন্ত উৎসবের সমাপ্তির পর বাউলের দল, স্ত্রীলোকের দল, নাচের দলের সাথে ঠাকুরদার কথা হয়। ঠাকুরদা তাদের রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুনর্বার অভিমত প্রকাশ করেন।

কাঞ্চীরাজ সুদর্শনার প্রতি আকৃষ্ট। সুবর্ণকে ভীতি প্রদর্শন করে সুদর্শনাকে সে পেতে চায়। সুদর্শনাকে পেতে মরিয়া কাঞ্চীরাজ প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেয়। রানি সুবর্ণর কাছে ছুটে এসে উদ্ধার করবার আকুতি জানায়। অবশেষে সুবর্ণ স্বীকার করে সে রাজা নয়। সুবর্ণ মুকুট ফেলে পালায়। অন্যদিকে রাজা এসে এই ঘরে আগুন পৌঁছবে না বলে রানিকে অভয় দান করে। রাজার কৃষ্ণ রূপ দেখে রানি চমকে ওঠে। সুকুমার রূপে মুগ্ধ রানি রাজাকে ছেড়ে বাবার গৃহে চলে আসে। দাসী সুরঙ্গমাও তার সাথী হয়। এই দৃশ্য অর্থাৎ অষ্টম দৃশ্য পর্যন্ত নাটকের গতি একই ছন্দে ধীরলয়ে এগোয়। শুরু থেকে পুনরাবৃত্তিমূলক ভাবের বিস্তার লক্ষ করা যায়। পরবর্তী দৃশ্যে সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজের উন্মোচন থেকে আচমকা নাটকের গতি ত্বরান্বিত হয়। সুদর্শনার আগমনের পূর্বেই পিতা কান্যকুব্জরাজের নিকট সংবাদ পৌঁছে যায়। আত্মসম্মান ও রূপের নেশা উভয়ের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত রানি পিতৃগৃহেও সুঅভ্যর্থনা পেতে ব্যর্থ হয়। কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে সাথে নিয়ে কান্যকুব্জে উপস্থিত হয়। সুদর্শনার গৃহত্যাগের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য রাজ্যের রাজারাও তাকে পেতে এসে হাজির হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *রাজা* নাটকে খল কাঞ্চীরাজ ও তার সহযোগী ৬ দুষ্টু রাজার কথা বলেছেন। অন্যদিকে *রাজা এবং অন্যান্য...* নাটকের নির্দেশক আজাদ আবুল কালাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনেতা ও তার ছায়াতলে আধিপত্যবাদী ছয় রাষ্ট্রনেতাকে উপস্থাপন করেছেন। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য, অস্থিতিশীলতা, সংকট ও যাবতীয় অশান্তির কারণ, এবং তারা বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্য ও সংঘাত বিস্তার করছে।



চিত্র ৩ : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনেতা (হ্যাট পরিহিত) ও অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাগণ



চিত্র ৪ : সুদর্শনাকে লাভ করতে উদগ্রীব সাত রাষ্ট্রনেতা

সাত রাজার সাথে যুদ্ধে কান্যকুব্জরাজ পরাজিত ও বন্দি হন। সিদ্ধান্ত হয় স্বয়ংবর সভা আয়োজনের। সুদর্শনা যাকে মাল্যদান করবে সেই তাকে অধিকার করবে। ভীরু, অধম কাঞ্চীরাজের ইশারায় চালিত সুবর্ণকে দেখে সুদর্শনা স্বীয় অপরিমিত চিন্তার গ্লানিতে দগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবে।

সভায় ঠাকুরদা প্রবেশ করে নিজেকে রাজার সেনাপতি পরিচয় দিয়ে রাজার আগমনের সংবাদ প্রদান করে। কাঞ্চীরাজ তার কথা অবিশ্বাস করে। যুদ্ধ হয় এবং রাজার নিকট অন্য সাত রাজা পরাজিত হয়। সকল রাজাকে দণ্ড দিলেও কাঞ্চীরাজকে রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে যুদ্ধ শেষে সুদর্শনার সাথে দেখা না করেই রাজা চলে যায়। রাজাকে আঘাত করার কথা ভেবে অনুতাপে জর্জরিত হয়েও সুদর্শনার আশা ছিল রাজা তাকে ডেকে নেবে। অতঃপর সুদর্শনা সুরঙ্গমাকে সাথে নিয়ে পথে বের হয়। পথে ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজও বের হয়। সুদর্শনা পায়ে হেঁটে, ধুলোয় মিলিত হয়ে, দাসী বেশে রাজভবনে যায়। এবার সাধনা দ্বারা লব্ধ রাজার সাথে আলোয় বেরোবার পূর্বে অন্ধকার সেই ঘরকে প্রণাম করে সুদর্শনা।

২.২ *রাজা ও অন্যান্য...* নাট্যে নিম্নবর্গের প্রতিরূপায়ণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *রাজা* নাটকটি লিখেছেন *গীতাঞ্জলি* ও *গীতিমাল্য* লেখার মধ্যবর্তীকালে। এসময়কার রচনায় রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মবাদ, স্রষ্টা, লীলা ইত্যাদি অধিকহারে প্রকাশ করেছেন। *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ*তে বলা হয়েছে—

> জন্মপূর্ব হইতে মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আছে বটে—কিন্তু মানুষের সাধনার ধারা সেই সম্বন্ধটি উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাধনার নাম তপস্যা—যে তাপে তপস্যা উজ্জ্বল হইয়া সার্থকতা লাভ করে তাহা দুঃখের তাপ। (প্রমথনাথ, ১৯৬৬ : ১৯৯)

রাজা এবং অন্যান্য... নাট্যের উপস্থাপনে আমরা দেখি রাজা থাকেন অন্ধকার ঘরে। রানি সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন হয় অন্ধকারে। রানি নানা উপায়ে রাজার চেহারা দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজা আলোর মাঝে রানির সামনে আসেন না। রাজা ধীরে ধীরে রানির কাছে নিজে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রানী সুদর্শনার সে বিলম্ব সহ্য হয়নি। সুরঙ্গমা রাজার দাসী, রাজাকে সে দেখতে পায় সেবার মধ্য দিয়ে। আবার ঠাকুরদার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব, তিনিও রাজাকে চেনেন। কেবল রানিই রাজাকে চেনে না। সুদর্শনা এই নাটকে রাজা তথা পরমাত্মাকে পেয়েছে বধুরূপে, সুরঙ্গমা পেয়েছে সেবিকা বা দাসীরূপে এবং ঠাকুরদা পেয়েছে বন্ধুরূপে। সুরঙ্গমা রাজাকে সেবা করার সুযোগ পায়। রানি রাজার চেহারা দেখার সুযোগ না পেলেও সুরঙ্গমার সেই সুযোগ হয়। ওদিকে রাজার সাথে ঠাকুরদার বন্ধুত্ব ঠাকুরদাকে অনন্য

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। শ্রেণি কিংবা সামাজিক অবস্থানগত দৃষ্টিকোণ থেকে সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা উভয়েই উচ্চবর্গে অবস্থান না করলেও সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাকে আমরা নিম্নবর্গীয় অবস্থানেও নির্ণয় করতে পারিনা।

ঠাকুরদা এই নাটকের এক বিশিষ্ট চরিত্র। *ডাকঘর*-এ ফকির, *মুক্তধারা*-য় ধনঞ্জয় বৈরাগী, *ফাল্গুনী*তে বাউল, *অচলায়তন*-এর দাদাঠাকুর আর *রাজা* নাটকের ঠাকুরদা চরিত্র। স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্রষ্টার রূপ, সৌন্দর্য ও রহস্য জানতে তাকে সাহায্য করেছে। ঠাকুরদা সর্বদা আনন্দময় কেননা প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্ম। ঠাকুরদার পাঁচটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, তথাপি স্রষ্টার প্রতি ভক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। যাপিত জীবনের আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখের তাৎপর্য ঠাকুরদার নিকট স্পষ্ট। সবই স্রষ্টার লীলা। কখনও কোমল কখনওবা কঠিন রূপে তা আসবে। কঠিনভাবে এলে ভয়ের কিছু নেই কেননা এরই পরিণাম হয়ত কোমল, মধুর কিছু। ঠাকুরদার সাথে পথের দৃশ্যে নাগরিকদের দেখা হয়। তারা ঠাকুরদার কাছে রাজাকে কেন দেখা যায় না, তার জবাব চায়। ঠাকুরদা স্বভাবসুলভ ঢঙে জবাব দেন—

> আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! এই যে অন্য রাজাগুলো, তারা তো উৎসবটাকে দ'লে ম'লে ছারখার করে দিলে—তাদের হাতি ঘোড়া লোক লশকরের তাড়ায় দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৫ : ৬৭৪)

নাগরিকরা তাদের অজানা বিষয় সম্পর্কে ঠাকুরদাকেই জিজ্ঞেস করে। ঠাকুরদাও নিঃসঙ্কোচে সেগুলোর জবাব প্রদান করে। তারা ঐক্যমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। স্বভাবসুলভ স্বদর্শন বর্ণনা করে সমস্যার সমাধান করেন ঠাকুরদা। যেন ঈশ্বরের আনন্দময় আভাস জনতার মানসে তিনিই সঞ্চার করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শের দ্বারা অরূপের সঙ্গে মর্ত্যলোকের জনতার নিকট জীবনের সমন্বয় সাধন করেন। বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ রাত গড়াবার পরও পশ্চিমে হেলে না পড়ায় বিস্মিত স্ত্রীলোকদের উৎসুক দৃষ্টির জবাবও ঠাকুরদার কাছে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, অজানা বিষয়, সমস্যার সমাধান ঠাকুরদার কাছে যেন তৈরি থাকে। ঠাকুরদা চরিত্রের এহেন বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে নিম্নবর্গ হিসেবে অভিহিত করা যায় না।



চিত্র ৫: নাগরিকগণের মাঝে ঠাকুরদা

চিত্র ৫-এ দেখা যাচ্ছে জনগণ উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে আছে। বসার ঢংয়ে মনে হচ্ছে তারা কিছু জানেনা। সমস্ত জানা মানুষ হল ঠাকুরদা। ঠাকুরদাকে মধ্যমণি করে বিন্যাস নির্মিত হয়েছে। নাটকের পথের দৃশ্যে স্ত্রীলোক ও নাগরিকদের কথা বলা হয়েছে। শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাট্যে পথের নাগরিক সম্পর্কে বলেছেন—

> যেন জীবনের বিচিত্র অঞ্চল থেকে উঠে-আসা মানুষগুলি চলাচলের মধ্য দিয়ে ক্ষণকালের জন্য এখানে মিলিত হয়ে চলে যায়। এরা ঠিক শেক্সপীয়রের জনতার তুল্য নয়, অথবা গিরিশচন্দ্রের গণচরিত্রের চেয়েও এরা ভিন্ন। নাটকের প্রয়োজনে নিবিড় সংযমে এদের গ্রথিত বলে সব সময়ে বোধ হয় না। বরং একটু হেলাফেলা আপাতশিথিল ভঙ্গিতেই এরা ছড়ানো থাকে যেন জীবনরঙ্গের এক ব্যাপক আভাস দেখাবার জন্য। (শঙ্খ, ১৯৬৯ : ৬৮)

এই স্ত্রীলোক ও নাগরিকগণ ব্যক্তি পরিচয়ে পরিচিত নন। তারা সামষ্টিক পরিচয়ে পরিচিত। "এইসব জনতার শুধু যে ব্যক্তিত্ব নাই তাহা নয়, ইহাদের ভূগোল বা ইতিহাস বলিয়াও কিছু নাই" (প্রমথনাথ, ১৯৬৬ : ৩৮৭)। মূল পাণ্ডুলিপিতে স্ত্রীলোক হিসেবে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং নাগরিক দল হিসেবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রের আগমন ঘটে। তারা রাজ্যের নাগরিক। তবে তাদের পেশা অজ্ঞাত। প্রাচ্যনাটের *রাজা এবং অন্যান্য...* নাট্যের প্রতিরূপায়ণেও সামষ্টিকতার আড়ালে তাদের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত হয়েছে।



চিত্র ৬ : ঠাকুরদা ও নাগরিকগণ।

৬ সংখ্যক চিত্রে দেখা যাচ্ছে নাগরিকগণ দূরে দাঁড়িয়ে তীব্র অভিপ্রায় নিয়ে ঠাকুরদার কথা শুনছে। ঠাকুরদার কাছে যেতে তাদের অনীহা। 'সবজান্তা' ঠাকুরদার নিকট থেকে নিরাপদ দূরত্বে তারা অবস্থান নিয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিক পরিচয় উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ সামষ্টিক পরিচয় থাকলেও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ হতে পারত। সেটি করা হয়নি। পথের নাগরিকগণ সব জিজ্ঞাসার জন্য ঠাকুরদার ওপর পরম নির্ভর করে থাকে। নিম্নবর্গ শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ, বর্ণ, বয়স ইত্যাদি নানা কারণে হতে পারে। সামষ্টিক পরিচয়, লৈঙ্গিক সরলীকরণ, অনির্ণীত শ্রেণি-পেশাগত অবস্থান এবং সর্বোপরি অজ্ঞতার কারণে নাটকে এই নাগরিকদের নিম্নবর্গে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *রাজা* নাটকে নাগরিকদের যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, প্রাচ্যনাট প্রযোজিত *রাজা এবং অন্যান্য...* নাট্যে নাগরিকগণের অভিনয়, শারীরিক ভঙ্গি, সহ অভিনেতা থেকে দূরত্ব, অভিব্যক্তি প্রভৃতি মিলে আরও অধিকভাবে তাদের অজ্ঞ ও ভীরু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাগরিকগণের অজ্ঞতার বিপরীতে ঠাকুরদার প্রজ্ঞা এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। এই নাগরিকগণ নিজেরা কিছু ভাবতে পারে না। কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে ঠাকুরদাকে প্রশ্ন করে এবং ঠাকুরদার জবাবকেই পরম উত্তর হিসেবে ধরে নেয়।

রাজা নাটকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরদা চরিত্রে অভিনয় করেন। *রাজা* নাটকের ঠাকুরদা চরিত্রকে ছাপিয়ে যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হেমেন্দ্রকুমারের ভাষায়, "ঠাকুর্দা রূপে তিনি নির্ভর করেছিলেন প্রধানত নিজের ভাব ও কণ্ঠস্বরের উপর" (শঙ্খ, ১৯৬৯ : ১৪২)। রবীন্দ্রনাথ হয়তো পূর্বেই ভেবে রেখেছিলেন যে ঠাকুরদা চরিত্রে অভিনয় করবেন, কেননা ড. সোমনাথ সিংহের মতে, "১৯১১ মার্চ ১৯ শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয় রাজা। নাটক রচিত হইলেই কবি নিজের মানস-সন্তানদের অভিনয় মঞ্চে দেখিতে চান। তাই 'রাজার' অভিনয় হইল। এই অভিনয়ে কবি ঠাকুরদার ভূমিকায় অভিনয় করেন।" (সোমনাথ, ১৯৯৯ : ১৬৮)

নাটকে পথের অন্যান্য নাগরিকদের মধ্যে ঠাকুরদা ঋষিরূপে আবির্ভূত হন। রাজার অস্তিত্ব, রাজার প্রকাশ, উৎসব পূর্ণিমা, যুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে নাগরিকগণ নিরন্তর প্রশ্ন করে যায় এবং ঠাকুরদা যা বলে তা- মেনে নেয়। অনেক্ষেত্রে হয়তো ঠাকুরদা কি বলছে তাও বুঝে উঠতে পারে না, তবু ঠাকুরদা বলেছে বলে কথা। "রবীন্দ্রনাটকের জনতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে মূঢ়তা ও ভীরুতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি তাহার প্রধান লক্ষণ।" (প্রমথনাথ, ১৯৬৬ : ৩৯১)

রাজা নাটকে এই জনতা অর্থাৎ পথের নাগরিকদের মধ্যে মূঢ়তা দেখা যায়। তাই যে কোনো বিষয়ে তারা ঠাকুরদার উপর নির্ভরশীল হয়। ঠাকুরদার প্রতি নাগরিক এতই আস্থাশীল যে কুম্ভের উক্তি "ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝি নে, কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৫ : ৬৮২)। ফলে নাগরিকদের চৈতন্যের নিজস্ব গড়ন উপস্থাপিত হয়নি। নাগরিক তথা জনতার নির্লিপ্ততা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেন—

> নাটকের অন্তে প্রধান পাত্রপাত্রীগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছে, জনতার গোড়াতেও যে শূন্য হাত ছিল, অন্তেও সেই শূন্য হাত, নাট্যকার যেন তাহাদের কথা অনেকক্ষণ বিস্মৃত হইয়াছেন। মূঢ়তা ও ভীরুতার দ্বারা দর্শকের হাসির খোরাক যোগাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ডাক পড়িয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তাহারা বিস্মৃত। রবীন্দ্রনাটকের অন্দরমহলে প্রবেশের পথে জনতা যেন হাসির পা-পোষ, দরজার বাহিরে তাহার স্বস্থান। (প্রমথনাথ, ১৯৬৬ : ৩৯২)

রাজা নাটকেও নাগরিকদের অবস্থান এরকম। প্রাচ্যনাটের প্রতিরূপায়ণে মূঢ়তা ও ভীরুতা, নিছক হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা, নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন ছিল অতিমাত্রায়।



চিত্র ৭: পথের নাগরিকগণের দাঁড়ানো, বসা ও তাকানোর ভঙ্গি



চিত্র ৮ : নাগরিকগণের গুটিসুটি হয়ে দাঁড়ানো

তিনজন অভিনেতা শঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে আছেন, দুজন অভিনেত্রী আবার হাসছেন। অর্থাৎ নাট্যক্রিয়া অনির্দিষ্ট।

উপরের চিত্রসমূহ দেখে বলা যায় বিন্যাস, শারীরিক ও মানসিক অভিব্যক্তি, চলন প্রভৃতি উপাদান দ্বারা নাগরিকদের বোকা, অজ্ঞ, ভীত হিসেবে উপস্থাপন করছে। ব্যক্তিক পরিচয় নয় সামষ্টিক পরিচয়ে তারা পরিচিত হয়েছে।



চিত্র ৯ : পথের নাগরিকদের সাথে ঠাকুরদা

উপরের চিত্রে পথের নাগরিকদের পোশাক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দৃশ্যের নাগরিকদের পোশাকের চেয়ে আলাদা। হাতে ধরা প্রপস হিসেবে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের পাশে ঠাকুরদাকে বেমানান লাগে। নিছক হাস্যরসের অবতারণার জন্য এই দৃশ্যের এরূপ বুনন হয়েছে, ফলে প্রাচ্যনাট দলের প্রতিরূপায়ণে পোশাক পরিকল্পনায় বিন্যাস ও ধারাবাহিকতায় চ্যুতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে নাট্যাভিনেতা ও নির্দেশক আমিনুর রহমান মুকুল *থিয়েটারওয়ালা* পত্রিকায় বলেন—

> অন্ধকারের রাজার দেশে যখন ইয়ো পোশাক পরিহিত যুবকদের দেখি বিশ্ববসু আর বিরূপারে প্রতিনিধিত্ব করছে, তখন ঠাকুরদাসহ রাজ্যের অন্য যুবকরা কিনা ধূতি ফতুয়া পরে চরিত্র সাজছে। হাল আমলের ইয়ো পোশাকের সাথে ধূতি ফতুয়া কিংবা মেয়েদের ধূতি কোর্তা কোন সময়কে মেলায়? এও কি পোশাকের ফিউশন? অথবা যদি বলি, কাঞ্চিরাজাদের কিংবা রাজবেশী সুবর্ণের পোশাকের সাথে সুদর্শনা বা সুরঙ্গমার পোশাক? কোথায় মেলে, বুঝতে পারি না। (আমিনুর, ২০০৮ : ১৫৮)

নাগরিকগণ কেবল ঠাকুরদার কথার অনুগামী হয়েছে। নাগরিক সচেতনভাবেই অধিক বোকা ও অজ্ঞ হিসেবে চরিত্রায়ণ করেছে। সুতরাং প্রাচ্যনাটের প্রতিরূপায়ণে নাগরিকগণ বোকা, অক্রিয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১ উপসংহার

নাটকে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার, শক্তিশালী অভিনয় এবং *রাজা* নাটকের পাণ্ডুলিপির সাথে সমকালীন বৈশ্বিক রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া *রাজা এবং অন্যান্য...* প্রযোজনার নিঃসন্দেহে প্রশংসার দিক, সেটি ভিন্ন আলাপ। বরং প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় প্রাচ্যনাট প্রযোজিত *রাজা এবং অন্যান্য...* নাটকের প্রতিরূপায়ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নাগরিকগণের আগমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘটেছে, কেবল অজ্ঞতার ডালা নিয়ে এবং 'ত্রাতা' ঠাকুরদা যত্ন নিয়ে সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সামষ্টিক পরিচয়, লৈঙ্গিক সরলীকরণ, অনির্ণীত শ্রেণি-পেশাগত অবস্থান এবং সর্বোপরি অজ্ঞতার কারণে নাটকে নাগরিকগণ নিম্নবর্গে পরিণত হয়েছে। নাগরিকগণের অজ্ঞতার বিপরীতে ঠাকুরদার প্রজ্ঞা এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতিরূপায়ণে নিম্নবর্গের ব্যক্তিক পরিচয়কে মাড়িয়ে সামষ্টিক পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। ঠাকুরদাকে মহিমান্বিত রূপদানের জন্য পথের নাগরিকদের অজ্ঞ, কম বোঝা-জানা লোক হিসেবে তুলে

ধরা হয়েছে। অযথা ঠাকুরদার দর্শন দ্বারা ভাবের বিস্তার ঘটানো হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *রাজা* নাটকে পথের নাগরিকদের আচরণ, ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের মধ্যেই নানা ছদ্মবেশ বা সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচ্যনাট প্রযোজিত *রাজা এবং অন্যান্য...* নাট্যের প্রতিরূপায়ণে তা অন্বেষণ করা হয়নি। ফলে নাগরিকগণের নিজস্ব ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সহায়কপঞ্জি

আমিনুর রহমান মুকুল (২০০৮)। "আত্মঘাতী প্রযোজনা : *রাজা এবং অন্যান্য*"। *থিয়েটারওয়ালা*, দশম বর্ষ : ২৫ সংখ্যা, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৮)। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

প্রমথনাথ বিশী (১৯৬৬)। *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা।

রণজিৎ গুহ (১৯৯৮)। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯১)। 'রাজা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড*। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা।

শঙ্খ ঘোষ (১৯৬৯)। *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সোমনাথ সিংহ (১৯৯৯)। *রবীন্দ্রনাথ : অভিনেতা ও প্রযোজক*। দুই বাংলার থিয়েটার, কলকাতা।

Gayatri Chakravorty Spivak (1994). Can the Subaltern Speak, COLONIAL DISCOURSE AND POST-COLONIAL THEORY (Edited by Patrick Williams and Laura Chrisman). Columbia University Press, New York.